ISSN-1605-7023

বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন পত্রিকা
নবম বর্ষ সংখ্যা
কার্তিক ১৪১১/নভেম্বর ২০০৪

# পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা - একটি পর্যবেক্ষণ

মোঃ ফয়সল আহম্মদ*
মোঃ হাসান রেজা**

***Abstract:*** *Domestic violence is a daily and often deadly fact of life for millions of women and girls in Bangladesh. UNFPA ranks Bangladesh one of the top among the countries where violence against women is prevalent. The various forms of violence range from verbal abuse to acid throwing, rape and murder. Gender based violence is perpetrated at many different levels, i.e. at the family, community and state levels. Historically, Bangladeshi women are relegated to an oppressive subordinate position in their family and in the society. Traditional gender-based attitudes and behaviors have been rooted in the consciousness of the men and the women of the country. This is expressed in limiting the freedom of women in many spheres of daily living. These limitations are protected by structures that facilitate the enactment and the preservation of oppressive practices. Moreover, patriarchal family structure and inegalitarian gender relations contribute in domestic violence. Women are defined as inferior; husbands are assumed to 'own' women, and to have the right to dominate them, if necessary by using force. Violence at family level is sometimes approved and sometimes even actively promoted through state laws and institutions and by prevailing patriarchal social norms. This is part of a phenomenon embedded in the context of cultural, socio-economic and political power relations that reduce women to economic and emotional dependency as the property of a male protector.*

## ভূমিকা

পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা আজও বাংলাদেশের সমাজকাঠামোতে কোন অপরাধ হিসেবে বিবেচিত হয় না, যা নারীর নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিরাট এক হুমকি স্বরূপ।[১] সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি, নারী আন্দোলনের বিস্তৃতি এবং নারী নির্যাতন বন্ধে আইন প্রণীত হওয়া সত্ত্বেও নারী নির্যাতনের ক্রমবর্ধমান হার নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হচ্ছে না বরং নারী ও শিশু নির্যাতনের হার আশঙ্কাজনকভাবে বাড়ছে। জাতিসংঘের "বিশ্ব জনসংখ্যা পরিস্থিতি ২০০০" প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে পুরুষ সঙ্গীর হাতে নারী নির্যাতনের হার অনুযায়ী বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে দ্বিতীয়। মেয়ে, নারী ও মেয়ে শিশু প্রত্যেকেই ঘরের

** সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।*

*** সহকারী অধ্যাপক, সমাজকর্ম বিভাগ, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, সিলেট।*

ভেতরে ও বাইরে সহিংসতার শিকার হয়।[২] পারিবারিক পর্যায়ে সহিংসতার বিষয়টি খানিকটা নীরবে নিভৃতে ঘটে চলেছে এবং সমাজ এটাকে বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য সমস্যা কিংবা অপরাধ হিসেবে মনে করে না বলে এর প্রকৃতি ও পরিধি সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হচ্ছে এবং বর্তমানে মহিলাদের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তা সবচেয়ে বড় হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী-হত্যার সাথে বিবাহোত্তর সহিংসতার যোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায়। যে কারণগুলো থেকে মূলতঃ পারিবারিক সহিংসতা ঘটে থাকে সেগুলো হলো- যৌতুক দিতে না পারা, বহুবিবাহ, দেনমোহর না দেয়া, অর্থনৈতিক দৈন্যদশা, সন্তানদের দেখাশুনা, স্ত্রীদের প্রতি সন্দেহ (পরকীয়া সংক্রান্ত) ইত্যাদি। তাছাড়া পিতৃগৃহে শাসনের জন্যেও মেয়েদের পুরুষের তুলনায় বেশি শারীরিক শাস্তির সম্মুখীন হতে হয়। বাল্য বিবাহও এক্ষেত্রে প্রভাব ফেলে। অল্প বয়েসে বিবাহের ফলে সংসার জীবনের প্রয়োজনীয় দায়িত্ব ও করণীয় সম্পর্কে ধারণা না থাকার পাশাপাশি নিজেকে রা করার ন্যূনতম যোগ্যতা অর্জিত হবার আগেই সন্তানের মা হতে হয় একটি মেয়েকে। এ অবস্থা তাকে নিজ পরিবারে নাজুক পরিস্থিতির মধ্যে ঠেলে দেয়। স্বামী ও স্বামীর সংসারের অন্যান্য নিকটাত্মীয়গণের নিকট অসহায় ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়।

শিশু বয়েস থেকেই ছেলে ও মেয়েদেরকে আলাদাভাবে বেড়ে উঠার মানসিকতায় গড়ে তোলা হয়। ছেলেদের যেখানে চঞ্চলতা, উচ্ছলতা, খেলাধুলা প্রভৃতিতে উৎসাহিত করা হয় সেখানে মেয়েদেরকে শিক্ষা দেয়া হয় ধীরতা, স্থিরতা ও বিনয়। পাশাপাশি মেয়েকে ঘরের কাজে মনোনিবেশ করার আদর্শে বড় করা হয়। আমাদের সামাজিকীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে ছেলেদের জগত ও মেয়েদের জগতকে এভাবে আলাদা করে দেয়া হয়। যেসব পরিবারে ছেলে মেয়েরা তাদের মাকে তাদের বাবা অথবা অন্যান্য সদস্য দ্বারা নির্যাতিত ও অপদস্থ হতে দেখে সেসব পরিবারে ছেলে মেয়েদের উপর এর মারাত্মক প্রভাব পড়ে। মেয়ে শিশুরা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীর মার খাওয়া কিংবা গালিগালাজসহ অন্যান্য সহিংসতাকে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে ধরে নেয়। অন্যদিকে ছেলেদের মধ্যে গড়ে উঠে নারীর প্রতি অশ্রদ্ধা, কর্তৃত্বপরায়ণতা ও আধিপত্যবাদ। সমাজে বিদ্যমান প্রথাগত লিঙ্গিয় শ্রম বিভাজন ও নারী পুরুষের পৃথক অবস্থানের জন্যে দায়ী। শ্রম বিভাজন অনুযায়ী সাধারণত পুরুষেরা পরিবারে অন্ন সংস্থানকারীর ভূমিকা পালন করবে, অন্যদিকে মহিলারা পুরুষের ভালোমন্দ দেখাশুনা ও সন্তান লালন পালনসহ ঘরের যাবতীয় কাজ করবে বলে ধারণা করা হয়। ফলস্বরূপ পুরুষরা হয় পরিবারের কর্তা ও নিয়ন্ত্রক, অন্যদিকে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে সারাদিন অক্লান্ত পরিশ্রম করে পুরুষের আধিপত্যকে অবনত মস্তকে মেনে নেয় নারী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ২৮ (২) ধারায় সকল পর্যায়ে লিঙ্গ ভিত্তিক সমতা বিধানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।[৩] সংবিধান অনুযায়ী নারী-পুরুষ, ধনী-দরিদ্র, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের সমঅধিকারের বিষয়টি স্বীকৃত হলেও অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারক প্রতিটি ক্ষেত্রেই নারীর অবস্থান পুরুষের তুলনায় নিচে। এ বিষয়টি বাংলাদেশ সরকারের পঞ্চম পঞ্চ বার্ষিকী

পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে সনাতন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার ব্যবস্থার কারণে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সুবিধা সীমিত হয়ে পড়েছে।[৪] অধ্যাপক আয়েশা নোমান সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর জীবন চক্রের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মর্যাদাহীনতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারী জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বরং পুরুষের আজ্ঞাবহ নির্ভরশীল উপেক্ষিত অথচ অপরিহার্য সত্তা হিসেবে বিবেচিত হন।[৫]

## নারীর সামাজিক অবস্থান ও নির্যাতন– বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ নারী। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে যে শুভ পরিবর্তন ঘটেছে তার অনেকখানি কর্তৃত্ব নারীর। দেশের পশ্চাৎপদতা ও ধর্মান্ধতার কারণে এ ব্যাপারে যারা নৈরাশ্য পোষণ করতেন তাদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে দেশের জন্ম নিয়ন্ত্রণ সফল হয়েছে ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।[৬] ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত আলোচিত হয়। সেটাও দেশের নারীদের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রে কৃষিখাত ছাড়া বেশির ভাগ খাতেই পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[৭] বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তির উপর প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত শ্রম শক্তি হচ্ছে মোট শ্রম শক্তির ৪৫.৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ১৯.৮ শতাংশ এবং নারী ৮২.৫ শতাংশ।[৮] আরেক হিসেবে দেখা গিয়েছে বার্ষিক আত্মপোষণশীল কাজের ৬৪ শতাংশ অবদান নারীর এবং ৩৬ শতাংশ অবদান পুরুষের।[৯] আশাব্যঞ্জক না হলেও বেতনভোগী কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। জাতীয় রপ্তানীর সিংহভাগ যে গার্মেন্টস শিল্প থেকে আসে সেখানকার বেশিরভাগ কর্মীই মহিলা। বাণিজ্যিক ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদ থেকে সকল পদে নারী আজ সাফল্যের সাথে অবদান রাখছে। সকল ধরনের কাজে পুরুষের সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকলেও নারীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও অবদানকে খাট করে দেখার প্রবণতা আজও বাংলাদেশের সমাজে প্রকট। নারীর কর্মকাণ্ডকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে কোথায় যেন একটা আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। নারীর গৃহশ্রম অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পরিমাপহীন রয়ে গেছে। গৃহকর্মের এই স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী সমাজকে বেকার ও নিস্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। সর্বোপরী পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে নারীরা অধস্তন। পরিবার, কর্মক্ষেত্র, সমাজ থেকে শুরু করে সর্বত্রই নারীরা সৃষ্টির শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছেন। সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ যুগেও ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার আর ফতোয়াবাজীর নির্মম শিকার হতে হয় নারীকে।

গত এক দশকে বাংলাদেশের নারী সমাজের মাঝে ধীরে ধীরে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও নারীরা আজও সংসদ থেকে রাজপথ আর রাজধানী

পরিকল্পনায় (১৯৯৭-২০০২) স্বীকার করে নেয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে সনাতন সামাজিক-সাংস্কৃতিক আচার ব্যবস্থার কারণে শিক্ষা, দক্ষতা উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সুবিধা সীমিত হয়ে পড়েছে।[৪] অধ্যাপক আয়েশা নোমান সামাজিক ব্যবস্থায় নারীর জীবন চক্রের সামগ্রিক ক্ষেত্রে মর্যাদাহীনতার কথা উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন- জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারী জীবনের কোন ক্ষেত্রেই মানুষ হিসেবে বিবেচিত না হয়ে বরং পুরুষের আজ্ঞাবহ নির্ভরশীল উপেক্ষিত অথচ অপরিহার্য সত্তা হিসেবে বিবেচিত হন।[৫]

## নারীর সামাজিক অবস্থান ও নির্যাতন– বাংলাদেশ প্রেক্ষিত

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধাংশ নারী। গত কয়েক দশকে বাংলাদেশে যে শুভ পরিবর্তন ঘটেছে তার অনেকখানি কর্তৃত্ব নারীর। দেশের পশ্চাৎপদতা ও ধর্মান্ধতার কারণে এ ব্যাপারে যারা নৈরাশ্য পোষণ করতেন তাদেরকে আশ্চর্য করে দিয়ে দেশের জন্ম নিয়ন্ত্রণ সফল হয়েছে ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন।[৬] ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার মাধ্যমে দরিদ্র্য বিমোচনের ক্ষেত্রে আজ বাংলাদেশের দৃষ্টান্ত আলোচিত হয়। সেটাও দেশের নারীদের বদৌলতে সম্ভব হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক সূচকের ক্ষেত্রে কৃষিখাত ছাড়া বেশির ভাগ খাতেই পুরুষের চেয়ে নারীর অবদান অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।[৭] বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তির উপর প্রকাশিত জরিপে দেখা গেছে পারিবারিক কাজে সাহায্যকারী হিসেবে নিয়োজিত শ্রম শক্তি হচ্ছে মোট শ্রম শক্তির ৪৫.৮ শতাংশ। এর মধ্যে পুরুষ ১৯.৮ শতাংশ এবং নারী ৮২.৫ শতাংশ।[৮] আরেক হিসেবে দেখা গিয়েছে বার্ষিক আত্মপোষণশীল কাজের ৬৪ শতাংশ অবদান নারীর এবং ৩৬ শতাংশ অবদান পুরুষের।[৯] আশাব্যঞ্জক না হলেও বেতনভোগী কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণ বাড়ছে। জাতীয় রপ্তানীর সিংহভাগ যে গার্মেন্টস শিল্প থেকে আসে সেখানকার বেশিরভাগ কর্মীই মহিলা। বাণিজ্যিক ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মহিলারা স্ব স্ব ক্ষেত্রে নিজেদের যোগ্যতার স্বাক্ষর রাখছেন। সেনাবাহিনীর উচ্চতর পদ থেকে সকল পদে নারী আজ সাফল্যের সাথে অবদান রাখছে। সকল ধরনের কাজে পুরুষের সমান যোগ্যতা ও দক্ষতা থাকলেও নারীর যোগ্যতা, দক্ষতা ও অবদানকে খাট করে দেখার প্রবণতা আজও বাংলাদেশের সমাজে প্রকট। নারীর কর্মকাণ্ডকে অর্থনৈতিক মানদণ্ডে বিচার করতে কোথায় যেন একটা আপত্তি লক্ষ্য করা যায়। নারীর গৃহশ্রম অদৃশ্য, স্বীকৃতিহীন ও পরিমাপহীন রয়ে গেছে। গৃহকর্মের এই স্বীকৃতিহীনতা জনসংখ্যার অর্ধাংশ নারী সমাজকে বেকার ও নিষ্ক্রিয়রূপে চিত্রিত করেছে। সর্বোপরী পুরুষতান্ত্রিক এ সমাজে নারীরা অধস্তন। পরিবার, কর্মক্ষেত্র, সমাজ থেকে শুরু করে সর্বত্রই নারীরা সৃষ্টির শুরু থেকেই বিভিন্নভাবে নিপীড়িত ও নির্যাতিত হয়ে আসছেন। সভ্যতার চরম উৎকর্ষের এ যুগেও ধর্মীয় গোঁড়ামী, কুসংস্কার আর ফতোয়াবাজীর নির্মম শিকার হতে হয় নারীকে।

গত এক দশকে বাংলাদেশের নারী সমাজের মাঝে ধীরে ধীরে সামাজিক, পারিবারিক ও রাষ্ট্রীয় সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও নারীরা আজও সংসদ থেকে রাজপথ আর রাজধানী

থেকে প্রত্যন্ত অঞ্চলে লিঙ্গীয় বৈষম্য ও পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবে নিষ্পেষিত। ১৯৯৭ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক ঘোষিত লিঙ্গ সম্পর্কিত উন্নয়ন সূচকে ১৭৪টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ১৪০তম। আবার বিশ্বের ১৬৪টি স্বল্পোন্নত দেশের জি ডি আই অনুযায়ী নারীর মূল্যায়নে দেশের অবস্থান ১২৮তম যা একুশ শতকের নারী জাগরণের পথকে শংকিত করে তোলে। বর্তমানে বাংলাদেশের আইন শৃংখলা পরিস্থিতির ক্রমাবনতির কারণে নারী পুরুষ উভয়েই ব্যাপক নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। তবে নারীর অসুবিধাজনক সামাজিক অবস্থান, দারিদ্র, শারীরিক গঠন, পুরুষ সমাজের হীন দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি কারণে পরুষের তুলনায় তাদের নিরাপত্তাহীনতা অনেকগুন বেশি। নারী-ধর্ষণ, খুন, পাচার, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি সংক্রান্ত তথ্যাবলী দৈনিক সংবাপত্রগুলোর মূল খবর হয়ে প্রতিদিনই প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের সামাজিক অবস্থা এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যেখানে তিন বছরের মেয়ে শিশু থেকে শুরু করে ৬০ বছর বয়সী মহিলা পর্যন্ত কোন না কোন ভাবে নির্যাতনের শিকার। সাম্প্রতিক কালে নির্যাতিতার অত্মহত্যার বিষয়টি পত্র পত্রিকায় প্রায়ই দেখা যায় যা সমাজ ব্যবস্থার ভয়াবহ চিত্রের বহির্প্রকাশ। পুলিশের ২০০১ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয় যে, দেশে প্রতিদিন গড়ে ৩৭জন নারী ও শিশু নির্যাতিত হচ্ছে এবং তাদের মধ্যে ১০ জন ধর্ষিত হচ্ছে। রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয়েছে পূর্ববর্তী বছরগুলোতে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ১৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এর আওতায় কেবল ঢাকা মহানগরীতেই ২ হাজারের অধিক মামলা বিচারের অপেক্ষায় ঝুলে রয়েছে। ১লা জানুয়ারী ২০০১ থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত সারা দেশে নারী নির্যাতনের চিত্র নারী পক্ষের "অধিকার" প্রত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী এসিড নিক্ষেপের শিকার হয়েছেন ২৯৭ জন, যৌতুকের কারণে নির্যাতিত হয়েছেন ৪৩ জন, যৌতুকের শিকার হয়ে আত্মহত্যা করেছেন ৬ জন, ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৭২০ জন এবং অন্যান্য কারণে নির্যাতিত ও হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন ১৫০ জন মহিলা।[১০] উপর্যুক্ত তথ্যাবলী থেকে নারীর প্রতি সহিংসতার ভয়াবহতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা হয়। পত্র পত্রিকা ও পুলিশের নিকট থেকে যে তথ্য পাওয়া যায় বস্তুতপক্ষে ঘটনার মাত্রা, পরিধি ও সংখ্যা তার তুলনায় কয়েকগুন হতে পারে। বহুল আলোচিত ও প্রাকাশিত ঘটনার পাশাপাশি কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনার চিত্র এসব উৎস ও সংবাদপত্র থেকে পাওয়া গেলেও গ্রাম প্রধান বাংলাদেশের বিস্তৃত ও বৃহত্তর অংশের নির্যাতনের সংবাদ থেকে যাচ্ছে জানাশুনার বাইরে। আমাদের দেশে কম নারীই আছেন যারা কখনই সহিংসতা ও নির্যাতনের শিকার হননি।

সাংস্কৃতিক উপাদান হিসেবে বিবাহ প্রথা, বৈবাহিক সম্পর্ক ও মাতৃত্ব নারীদের নিম্ন মর্যাদাকে টিকিয়ে রেখেছে। সামাজিক বিধি ব্যবস্থা ও মাতৃত্বের মূল্যবোধ তাদের পশ্চাৎপদ রাখে এবং পরিণতিতে বাংলাদেশের নারী সমাজের দৈনন্দিন জীবন যাত্রা ছক বাঁধা ঘর গৃহস্থালী কাজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত হয়েছে যা মজুরিহীন হিসেবে গণ্য হয়। ফলস্বরূপ তাদেরকে স্বামীর উপর নির্ভরশীল সত্তা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এ কারণেই মূলতঃ যৌতুকের মত মারাত্মক একটি কু-প্রথা আধুনিক সভ্য সমাজে

ব্যাপকভাবে প্রচলিত রয়েছে। যৌতুকের কারণে নারীদের প্রতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় সহিংসতার ঘটনা ঘটে থাকে। যৌতুকের কারণে স্বামী, শাশুড়ী অথবা শ্বশুর বাড়ীর লোকজন কর্তৃক মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন, হত্যা কিংবা নির্যাতনের কারণে আত্মহত্যার ঘটনা দৈনিক সংবাদপত্রে পাতায় নিয়মিত খবরে পরিণত হয়েছে। রেহনুমা আহমেদ ও মিলু শামসুন নাহার তাঁদের "Brides and the Demand System in Bangladesh; A Study" শিরোনামের গবেষণায় উল্লেখ করেছেন বিয়ের আগে বা পরে যৌতুক মেয়েদের বিয়ের একটি অলিখিত শর্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি মেয়ের বাবা-মা যৌতুক দিতে রাজী হয়ে দিতে না পারেন অথবা দেরী করেন তাহলে মেয়ের ভাগ্যে শাশুড়ীর গঞ্জনা, স্বামীর রক্তচক্ষু এবং দৈহিক নির্যাতন অবশ্যম্ভাবী। যৌতুকের অত্যাচারে বিবাহযোগ্য মেয়েদের মা-বাবারা দিশেহারা, প্রত্যেকদিনই যৌতুকের বলি হচ্ছে অনেক স্ত্রী। নির্যাতিত হয়ে মৃত্যু অথবা আত্মহত্যার মত ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে, বিয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে। The Bangladesh Times পত্রিকায় প্রকাশিত এক তথ্যে দেখা যায় যৌতুকের জন্যে একমাত্র বরগুনা জেলাতেই বিশ হাজার মেয়েকে বিয়ে দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না।[১১] অথচ যৌতুক গ্রহণ ও প্রদানে শাস্তির বিধান করে বাংলাদেশ সরকার যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করে। কার্যত এ আইনের বাস্তব কোন প্রয়োগ কিংবা অনুশীলন সমাজে পরিলক্ষিত হয় না।

পরিবার একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান। বিবাহ এর ভিত্তি। অথচ অনেক ক্ষেত্রে প্রথাগত অসম অবস্থানের মধ্য দিয়ে বৈবাহিক সম্পর্ক সৃষ্টি হচ্ছে। সেক্ষেত্রে নারীকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বিবেচনা না করে বরং পুরুষের তুলনায় তাঁকে অধস্তন হিসেবে তুলনা করে। একটি অলিখিত লাইসেন্স সমাজ কর্তৃক স্বামীকে দিয়ে দেয়া হয় যার ভিত্তিতে স্বামী স্ত্রীকে তার নিজের প্রয়োজন ও ইচ্ছে অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে এবং স্ত্রীকে স্বামীর সেবায় নিজেকে আত্মনিয়োগের জন্যে পরামর্শ দেয়া হয়। এ অসম অবস্থানের কারণে পরিবারে স্বামী স্ত্রীর ভূমিকা ও মর্যাদা পৃথক হয়ে যাচ্ছে। প্রত্যেকটি পরিবারের দিকে তাকালে আমরা এ অবস্থার প্রতিফলন দেখতে পাই।[১২] পারিবারিক ক্ষেত্রে ধর্মীয় আইন এবং উহার অপব্যাখ্যা এটিকে আরো শক্তিশালী করেছে। ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের জন্যে ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতায় বিবাহ, সম্পত্তি অধিকার, বিচ্ছেদ ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট বিধান প্রচলিত থাকলেও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে বিবাহ রেজিস্ট্রি বাধ্যতামূলক নয়। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় সব ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে রেজিস্ট্রি ছাড়া বিয়ে হচ্ছে। মা ও শিশু বিষয়ক উন্নয়ন সংস্থা Mother and Child Foundation কর্তৃক ২০০০ সালে পরিচালিত এক সমীক্ষায় দেখা যায় বৃহত্তর দিনাজপুর ও রংপুরের ৮টি জেলার গ্রামাঞ্চলে শতকরা ৯৮.৬ ভাগ বিয়ে হয় রেজিস্ট্রি ছাড়া। এ ধরনের বিয়ের ফলে বহুবিবাহ, স্ত্রীকে ফেলে উধাও হয়ে যাওয়া, ভরণপোষণ না দেয়া এবং শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন ব্যাপকভাবে সংঘটিত হয়। বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী-হত্যার সাথে বিবাহোত্তর সন্ত্রাসের যোগ রয়েছে বলে বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে জানা যায়। বস্তুত গৃহ পরিবেশে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন প্রকৃতি ও ব্যাপকতা সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্য প্রাপ্তির বিষয়টি বাংলাদেশের সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত জটিল। নির্যাতিত

হয়েও বাস্তব পরিস্থিতির কারণে নির্যাতনের ঘটনাবলী কাউকে না জানিয়ে আজীবন নিরবে সহ্য করে চলেছেন অসংখ্য নারী। সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদকে নারীর জন্যে নিন্দনীয় হিসেবে দেখে ও বিচ্ছেদ পরবর্তী জীবন নারীর জন্যে বিষময় করে তোলার জন্যে নানা ব্যবস্থাবলী টিকিয়ে রেখেছে বলে ভয়াবহ কলহ ও নির্যাতনপূর্ণ দাম্পত্য জীবন নিয়েও একজন নারীকে স্বামীর সংসারে থাকতে বাধ্য হতে হয়। কারো সামনে, এমনকি নিকট আত্মীয়, বাবা-মা'র কাছে নারী নির্যাতিত হবার কথা জানালেও তার প্রতিকারের পরিবর্তে অনেক ক্ষেত্রে নারীকেই দোষারোপ করা হয় অথবা সব কিছু মানিয়ে নিয়ে স্বামীর মন যুগিয়ে চলার পরামর্শ দেয়া হয়। পাশাপাশি পরিবারের মর্যাদাহানী হবে এ যুক্তি দেখিয়ে নির্যাতনের ঘটনাগুলো কাউকে না বলে বরং সহ্য করে যেতে নারীকে এক রকম চাপ প্রয়োগ করা হয়। এ অবস্থা পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিবারের কন্যা সন্তানের মানসিকতাকে প্রভাবিত করে। এমনও দেখা যায় যে, ছোটখাট অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তিরস্কার কিংবা মারধর করবে, স্বামীর এ তথাকথিত অধিকারকে স্ত্রী নিজেই স্বীকৃতি দান করে থাকেন। যখনই কোন স্ত্রী ছোটখাট ভুল করে তখন তাদের স্বামীদের একারণে শাস্তি দেবার পূর্ণ অধিকার আছে বলে স্ত্রীরা মনে করে। তাদের ধারণা নারীদের এমনভাবে চলা উচিত যাতে তারা স্বামীদের হাতে প্রহৃত হওয়া থেকে নিজেদেরকে রক্ষা করে সম্পূর্ণ আদর্শ নারী হিসেবে নিজেদেরকে গড়ে তুলতে পারে[১৩]। মূলতঃ সমাজের প্রচলিত মূল্যবোধ ব্যবস্থা নারীর এ ধরনের হীন মানসিকতার জন্যে দায়ী।

সাম্প্রতিক কালে পরিচালিত বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতির সমীক্ষায় গৃহপরিবেশে নারীর প্রতি সহিংসতার বিষয়টি উদঘাটন করে; দেখা যায় মহিলাদের উপর অবহেলা থেকে শুরু করে মধ্যম মাত্রা থেকে চূড়ান্ত পর্যায়ের শারীরিক নির্যাতন করা হয়। মহিলাদের উপর সবচাইতে বেশি যন্ত্রণাদায়ক যে ধরনের নির্যাতন আছে সেগুলোর মধ্যে তাদের অস্তিত্বের প্রতি সম্পূর্ণ উদাসীনতা, গালিগালাজ, নিয়মিত শারীরিক নির্যাতন যা থেকে গুরুতর আঘাতের সম্ভাবনা থাকে এগুলো অন্যতম। অন্যদিকে স্ত্রীরা মনে করে যে, তারা যদি ঘরের কোন কাজ ঠিকমতো না করে বা তাদের স্বামীদের কোন কারণে সন্তুষ্ট করতে না পারে তাহলে তাদেরকে একটা বড় শাস্তি দিয়ে শিক্ষা দেবার অধিকার তাদের স্বামীদের আছে এবং তা অতি সামান্য কারণের জন্যও হতে পারে যেমন- কোন গৃহস্থালী কাজ করতে না পারা বা গরম গরম কিংবা সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করতে ব্যর্থ হওয়া ইত্যাদি[১৪]। মহিলাদের এধরনের দৃষ্টিভঙ্গি তাদের প্রতি সহিংসতার মাত্রাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। তবে এজন্যে সনাতনী পুরুষতান্ত্রিক পারিবারিক মূল্যবোধ ও প্রথা অনেকাংশে দায়ী।

আইনী ব্যবস্থা থাকলেও আইনের ফাঁক-ফোকর ও জটিলতা, দুর্নীতি, রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদি কারণে অপরাধ করেও নির্যাতনকারীরা রেহাই পেয়ে যাচ্ছে। অপরাধের উল্লেখযোগ্য ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি কম হবার কারণে অপরাধ প্রবণতা দিন দিন বেড়েই চলছে। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয়[১৫] :

## সারণি - ১: ১৯৯৬-২০০১ (জুন) পর্যন্ত নারী নির্যাতনের ঘটনা

(সহিংসতার ধরন ও সংখ্যা)

| সন | ধর্ষনের সংখ্যা | এসিড নিক্ষেপের সংখ্যা | অন্যান্য | মামলার সংখ্যা |
|---|---|---|---|---|
| ১৯৯৬ | ২৩৮ | ৫১ | ৫৫ | ৭৭ |
| ১৯৯৭ | ৭৩৩ | ১১০ | ২৩৪ | ১৭৭ |
| ১৯৯৮ | ১৩০২ | ১৩৮ | ২৭৩ | ২৩৯ |
| ১৯৯৯ | ৯৪২ | ১৭৮ | ৩৩০ | ২৫৩ |
| ২০০০ | ৭৫৯ | ১৮৬ | ৩৪২ | ২৮১ |
| ২০০১(জুন পর্যন্ত) | ২৭৯ | ৮৮ | ১৮৮ | ৯১ |

বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায় ২০০০ সালের তুলনায় ২০০১ সালে নারী নির্যাতনের ঘটনা অস্বাভাবিক্ষ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ধর্ষণ, এসিড নিক্ষেপ, অপহরণ, যৌতুকের জন্যে নির্যাতন এমনকি হত্যার মত ঘটনা অনেক বেড়েছে। ২০০০ সালে সারা দেশে নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২০০১টি এবং ২০০১ সালে তা ৩ হাজার টি'তে দাঁড়ায়।[১৬] এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় বাংলাদেশে গড়ে প্রতি ঘন্টায় একজন নারী নির্যাতনের শিকার হন।[১৭] আরেকটি উৎস থেকে জানা যায় ২০০২ সালে ৩১৮৯ জন মহিলা ধর্ষণের শিকার হন, ২০০১ সালে এ সংখ্যা ছিল ৩১৪০ জন। এসিড নিক্ষেপ গত ২ বছরের তুলনায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে।[১৮] অভিজ্ঞ ও ওয়াকিবহাল মহলগুলোর মতে দেশে নারী নির্যাতনের প্রকৃত ঘটনা আরো অনেক বেশি। প্রভাবশালী মহলের চাপে অনেক ঘটনার মামলা হয় না। অনেকে আতঙ্কে কিংবা মান সম্মানের ভয়ে মামলা করে না কিংবা কাউকে জানায় না। পারিবারিক পর্যায়ে সংগঠিত সহিংসতা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে জানাশুনার বাইরে থেকে যায়। বস্তুতপক্ষে মোট সহিংসতার একটি বড় অংশই ঘটে থাকে পারিবারিক পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গে নিচের সারণিটি লক্ষণীয়।[১৯]

## সারণি-২ : সারাদেশে নারী নির্যাতনের চিত্র

(১লা জানুয়ারী থেকে ২৮শে ফেব্রুয়ারী ২০০২ পর্যন্ত)

| নির্যাতনের ধরন | সংখ্যা |
|---|---|
| এসিড নিক্ষেপের শিকার | ২৯৭ জন |
| যৌতুকের কারণে নির্যাতিত | ৪৩ জন |
| যৌতুকের কারণে নিহত | ১৩৯ জন |
| যৌতুকের শিকার হয়ে অত্মহত্যা | ৬ জন |
| ধর্ষণের শিকার | ১২০ জন |
| ধর্ষিত শিশুর সংখ্যা | ১৭১ জন |
| অন্যান্য কারণে নির্যাতিত | ১৫০ জন |

জাতিসংঘের জনসংখ্যা তহবিল কর্তৃক প্রকাশিত একটি রিপোর্টে বাংলাদেশকে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের দিক থেকে বিশ্বের এক নম্বর দেশ হিসেবে চিহ্নিত করে উল্লেখ করেছে যে, বাংলাদেশে প্রধানমন্ত্রী ও সংসদের বিরোধী দলীয় নেত্রী উভয়ই মহিলা হওয়া সত্ত্বেও প্রায় ৫০ শতাংশ হত্যা মামলা বৈবাহিক নির্যাতন, যৌতুক প্রদানে অসামর্থ্য ও বহুগামী পুরুষদের বহুগামীতায় বাধা দানের কারণে সংঘটিত হয়।[২০] অন্যদিকে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ও এর ব্যাপকতার দিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান আশংকাজনক এবং এ পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও ক্রমাবনতি উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে । বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকার রিপোর্ট পর্যালোচনা করে আইন ও শালিস কেন্দ্র পারিবারিক পর্যায়ে সংঘটিত নারী নির্যাতন ও সহিংসতার নিম্নবর্ণিত পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে:[২১]

**সারণি-৩: পারিবারিক পর্যায়ে সংঘটিত নারী নির্যাতনের সংখ্যা**
(১৯৯৭ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত)

| নির্যাতনের প্রকৃতি | সন | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯৯৭ | ১৯৯৮ | ১৯৯৯ | ২০০০ | ২০০১ | ২০০২ | ২০০৩ |
| স্বামী র্কতৃক শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন | ১৭ | ২৯ | ৩৫ | ৪৫ | ১৮ | ৩২ | ৩৫ |
| স্বামী র্কতৃক হত্যা | ১৭৯ | ২০০ | ২৪৬ | ২২৬ | ১৬৯ | ২২৯ | ১৫৫ |
| স্বামীর পরিবারের সদস্য র্কতৃক শারিরীক শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন | ১১ | ০৫ | - | ১১ | ০৮ | ২০ | ৩৮ |
| স্বামীর পরিবারের সদস্য র্কতৃক হত্যা | ১৭ | ২৩ | ১৭ | ৩১ | ৩০ | ৩৭ | ৪০ |
| আপন পরিবার কর্তৃক নির্যাতন | ০১ | ০৬ | ০৫ | ০১ | ০৬ | ০৬ | ২১ |
| আপন পরিবার কর্তৃক হত্যা | ০৮ | - | ২৬ | ২৭ | ২০ | ২৬ | ৪২ |
| পরিত্যাক্ত/ তালাকপ্রাপ্ত | ০১ | ০১ | ০১ | ০১ | ০২ | - | - |
| মোট | ২৩৪ | ২৭৩ | ৩৩০ | ৩৪২ | ২৫৩ | ৩৫০ | ৩৩১ |

## তত্ত্বীয় বিশ্লেষণে নারী নির্যাতন

পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করা একটি অত্যন্ত জটিল কাজ। তবে নারীর প্রতি যুগ যুগ ধরে লালিত নেতিবাচক মনোভাব, সমাজকাঠামো, অর্থনীতি, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এবং রাষ্ট্রীয় আইনের মাঝে সহিংসতার বীজ প্রোথিত।[২২] তবে কোন কারণটি আগ্রাসী কিংবা কোনটি অপরটিকে প্রণোদনা যোগায় তা নিরূপণে সমাজতাত্ত্বিক, মনোবিজ্ঞানি এবং সমাজকর্মীদের মাঝে বির্তক রয়েছে। সমাজবিজ্ঞানের নানা শাখায় বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন দলের উপর পরিচালিত গবেষণা লব্ধ ফলাফল ভিন্ন ভিন্ন তত্ত্ব আকারে প্রকাশ করেছেন। এ সকল তত্ত্বকে দুটো দৃষ্ঠিভঙ্গিতে দেখার প্রবণতা রয়েছে–একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক এবং পরিবার ও সমাজকেন্দ্রিক তত্ত্ব।[২৩]

একক ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্বের প্রধান শর্ত হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যক্তি নির্ভর। অর্থাৎ প্রতিটি নারী নির্যাতিত হওয়ার কারণ ভিন্ন এবং এসব কারণের মাঝে যোগসূত্র প্রতিষ্ঠা করা যায় না। এই তত্ত্বের মূল সুরটি হচ্ছে- কিছু কিছু পুরুষ মানসিক ভাবে অসুস্থ ও অপরিপূর্ণ হওয়ায় তাদের ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যহীনতা প্রকট থাকে। এর বহির্প্রকাশ ঘটে পরিবারে নারীর প্রতি সহিংস আচরণের মাধ্যমে।[২৪] এক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বের ভারসাম্যহীনতাকে ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে আবেগ নিয়ন্ত্রণের অক্ষমতা দিয়ে। যখন ব্যক্তির আবেগ তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায় তখন সে সহিংস হয়ে উঠে এবং বল প্রয়োগ করে তুলনামূলকভাবে দুর্বল নারীর উপর। এক্ষেত্রে পারিপার্শ্বিক অন্যান্য শর্ত যেমন সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কের ধরন ইত্যাদি বল প্রয়োগের মাত্রাকে প্রভাবিত করতে পারে। আরো তীব্র ভাষায় এলিয়ট (Elliot)[২৫] এ ধরনের মানসিক গঠনকে বৈকল্যপূর্ণ বর্ণনা করে যুক্তি দেন যে শুধুমাত্র পরিবারে স্ত্রীদের প্রতিই এদের আগ্রাসী মনোভাব সীমাবদ্ধ নয় বরং অন্যান্য সময় (যেমন কর্মস্থলের আচরণ, গাড়ী চালানো ইত্যাদিতে) এরা শারীরিক শক্তির মাপকাঠিতে বিচার করে। এ তত্ত্বের আরো একটি ধারা স্ত্রী নির্যাতনের কারণ হিসেবে মাদক ব্যবহারকে দায়ী করে। ধারণা করা হয় যে সব পরিবারে স্বামী মাদক কিংবা এ্যালকোহল আসক্ত তারা শারীরিক নিয়ন্ত্রণ হারানোয় স্ত্রীদের প্রতি রুঢ় ও আগ্রাসী হয়ে উঠে। পুরুষেরা কেন মাদক বা এ্যালকোহলের ব্যবহার বন্ধ করে দিলেও একই রকম নির্যাতন করে তার উত্তর এ তত্ত্বটি দিতে ব্যর্থ হওয়ায় সমালোচকরা মনে করেন মাদক ব্যবহার হচ্ছে স্ত্রী নির্যাতনের অজুহাত মাত্র, প্রকৃত কারণ নয়।[২৬] ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্বে নবতম সংযোজনটি হচ্ছে পৌরুষতত্ত্ব (Masculinity)। এই তত্ত্বের আলোকে পুরুষ হয় পরিবারের যোগানদাতা (Provider) এবং রক্ষাকর্তা (Protector)। পুরুষের এই দুই ভূমিকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বীকৃতির ফলে মানস-গঠন কর্তৃত্ববাদী হয়। যোগানদাতার ভূমিকায় পুরুষ পরিবারের উপার্জন এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ যোগান ও পরিবারের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধিতে সচেষ্ট থাকে। অন্যদিকে রক্ষাকর্তা হিসেবে সে স্ত্রী, সন্তান ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপর প্রশ্নাতীতভাবে কর্তৃত্ব দেখাবে। এ দু'বৈশিষ্ট্যের ফলে পুরুষ-মানস অত্যন্ত অহংকারী ও কর্তৃতপরায়ণ হয়। সাধারণত পরিবারে স্ত্রী 'পৌরুষ' কে প্রশ্নবিদ্ধ করে তার উল্লেখিত দু'টি ভূমিকা পুরণের ব্যর্থতার কারণে। নিজের ব্যর্থতা ও স্ত্রীর অভিযোগ পুরুষের অহমে আঘাত করে ও তাকে সহিংস করে তোলে। ফলশ্রুতিতে স্ত্রীর প্রতি তার আচরণ সহিংস হয়ে উঠে।[২৭]

পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতা ব্যাখ্যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্বগুলো অনেক বিষয়কে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্যক্তিকেন্দ্রিক তত্ত্বগুলো এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ যে তথাকথিত বিকল মানসিক গঠনের ব্যক্তিরা কেন শুধু স্ত্রীদের প্রতি সহিংস, অন্যদের প্রতি নয়। পরিবার ও সমাজকেন্দ্রিক তত্ত্বসমূহ পরিবারকে একটি অন্যতম সামাজিক প্রতিষ্ঠান বিবেচনা করে এতে যে সমস্ত নেতিবাচক উপাদান বিদ্যমান তার আন্তঃক্রিয়া বিশ্লেষণ করে। এ তত্ত্বগুলিতে পরিবারে হতাশার কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বেড়ে যায় বলে মন্তব্য করা হয়।[২৮] আবার সমাজ ও পরিবারকেন্দ্রিক তত্ত্বগুলোকে ব্যষ্টিক ও সমষ্টিক (micro & macro)

প্রেক্ষিতে দেখার প্রবণতাও রয়েছে। সমষ্টিক (macro) প্রেক্ষিতে পারিবারিক কাঠামো ও সম্পর্কের সাথে নারীর প্রতি সহিংসতা যুক্ত করে কতগুলো তত্ত্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এগুলো হচ্ছে সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্ব (Social Learning Theory), সামাজিক বিনিময় তত্ত্ব (The Social Exchange Theory), হতাশা আগ্রাসন তত্ত্ব (The Frustration Aggression Theory) এবং পুরুষ আন্তঃসহযোগিতা তত্ত্ব (Male Peer Support Theory) । এ তত্ত্বসমূহ নারীর প্রতি সহিংসতাকে সমাজ ও পরিবারে বিভিন্ন দলের ত্রুটিপূর্ণ সামাজিক ও আন্তঃসম্পর্কের ফল বলে ব্যাখ্যা দেয়া হয়। উপরন্তু ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক সম্পর্ক সহিংসতাকে উসকে দেয়। উদাহরণস্বরূপ বলাযায় সামাজিক শিক্ষণ তত্ত্ব মনে করে শক্তিশালী শারীরিক কাঠামো এবং পর্যবেক্ষণপ্রসূত শিক্ষণ সহিংসতার মূলে কাজ করে। পুরুষ শিশু যদি পরিবারে তার পিতার দ্বারা মা কিংবা অন্যান্য পুরুষ দ্বারা মহিলাদের নির্যাতিত হতে দেখে সে এটি স্বাভাবিক বলে ধরে নেয়। এই শিক্ষণ অবচেতনভাবে লালিত হয়ে পরবর্তিতে নিজের পরিবারে ব্যবহারের প্রবণতা দেখা দেয়।[২৯]

হতাশা আগ্রাসন তত্ত্বে বলা হয়ে থাকে পরিবারে ব্যক্তির যে কোন ইচ্ছা অনিচ্ছা বাধাগ্রস্ত হলে তার প্রতিক্রিয়ায় পুরুষ নারীর প্রতি সহিংস হয়। অন্যদিকে পুরুষ আন্তঃসহযোগিতা তত্ত্বে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ শিক্ষণ প্রকাশ ও যুক্তিযুক্ত করতে পুরুষদের একে অন্যকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহযোগিতা করে। যখন কোন পুরুষ পরিবারে সমস্যাগ্রস্ত হয় তা সমাধানে সে তার পরিচিত পরিমণ্ডল অথবা অন্যান্য সামাজিক নেটওয়ার্কের সহযোগিতা নেয়। এসময় তাকে নারীকে নিয়ন্ত্রণ অথবা নারীর প্রতি সহিংস হওয়ার পরামর্শ দেয়া হয়।[৩০]

নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মনো-সামাজিক তত্ত্বের গুরুত্ব স্বীকার করলেও তাঁরা এসব তত্ত্বকে বৃহত্তর সামাজিক কাঠামোতে সম্পৃক্ত করতে অনাগ্রহী। তারা তত্ত্বগুলোকে পুরুষতান্ত্রিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে যুক্ত করে উল্লেখ করেন যে, এর ফলে সমাজে নারী পুরুষের মাঝে শক্তির অসম বিন্যাস পরিলক্ষিত হয় যা সহিংসতা লালন করে থাকে।[৩১] তাঁদের মতে ঐতিহাসিকভাবে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো পুরুষ নিয়ন্ত্রিত হওয়ায় সামাজিক সম্পর্কে উচ্চ–নিম্ন ব্যবধান গড়ে উঠেছে এবং এতে নারীর প্রান্তিক অবস্থান নির্ধারিত হয়ে আছে। সমাজে নারীর প্রান্তিক অবস্থান নারী –বিদ্বেষী ও বৈষম্যমূলক রীতি প্রথার উৎপত্তি ও বিকাশের মূল হিসেবে কাজ করছে। সাংস্কৃতিক উপাদান যেমন স্ত্রীকে নিয়ন্ত্রণ স্বাভাবিক এ ধরনের মানসিকতা ও প্রথা নারীর স্বাধীন সত্ত্বাকে স্বীকৃতি না দিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণে পুরুষকে আগ্রহী করে। এর ধারাবাহিকতা পুরুষ যখন নারীর প্রতি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনে ব্যর্থ হয় তখন সে সহিংসতা দেখায়।[৩২] এ বিষয়ে Buzawa এবং Bazawa বলেন নারীর প্রতি সহিংসতা অতি প্রাচীন সময় হতেই বিদ্যমান। ইহুদী, খ্রীস্টান এবং অন্যন্য পিতৃতান্ত্রিক ধর্মগুলো পুরুষ নিয়ন্ত্রিত পরিবারকে সমর্থন দিয়েছে ও টিকিয়ে রেখেছে। এ কাঠামো অনুযায়ী মহিলারা তাদের নিজেদের যে কোন চাহিদা আকাঙ্খা ইত্যাদি পুরুষের অনুমোদন ছাড়া বাস্তবায়নে অক্ষম।

নারীবাদের র‍্যাডিকেল তত্ত্ব শুধু ধর্মকে নয় বরং সমাজে বিদ্যমান শ্রেণী ব্যবস্থাকে নারীর প্রতি সহিংসতার অন্যতম কারণ বলে মনে করে। পুজিবাদী সমাজব্যবস্থায় সম্পদের ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদা ও ক্ষমতা নিধারিত হয়। ঐতিহাসিকভাবেই পুঁজিবাদ (১) নারীর প্রজনন কাজ (২) নারীর কাজ ও (৩) নারীর আয় নির্ধারণ করে তাকে সবসময় দমিয়ে রেখেছে। এ ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে পিতৃতন্ত্র নারীর প্রতি সহিংসতাকে উৎসাহিত করে।[৩৩]

বাংলাদেশের সামাজিক পরিস্থিতিতে উপর্যুক্ত তত্ত্বে প্রায় প্রতিটিই প্রযোজ্য। আলোচ্য গবেষণায় একক কোন তত্ত্বকে প্রমাণ না করে সবগুলো তত্ত্বের আলোকে নারীর প্রতি সহিংসতাকে ব্যাখ্যা দানের চেষ্টা করা হয়েছে।

## যৌক্তিকতা ও গবেষণা পদ্ধতি

নারীরা আজকাল তুলনামূলকভাবে অধিক সংখ্যায় বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত হচ্ছেন। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণে আগত নারীর সংখ্যাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে একমাত্র নারীর উপার্জনে সংসার পরিচালিত হচ্ছে। ঘর গৃহস্থালীর বাইরে নারী আজ পরিবারের উপার্জনকারী সদস্য হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছেন। নারী প্রগতির এ সভ্য সমাজেও তাঁরা নিজ পরিবারের নিকটজন কর্তৃক শোষিত ও নির্যাতিত হচ্ছেন। পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা বেশির ভাগ সময় নারী নির্যাতনের হিসেব থেকে বাদ পড়ে এবং অনেকটা প্রতিকার ও প্রতিরোধহীন অবস্থায় প্রতিটি পরিবারেই কম বেশি নির্যাতনের ঘটনা ঘটে থাকে। পরিবার সম্প্রীতির মেলবন্ধন। পরিবারে একজন মানুষ সকল ধরনের নিরাপত্তা ও আশ্রয় পেয়ে থাকে। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক সত্য হলো নারীরা পরিবারেই সবচাইতে বেশি নিগৃহীত, নিপিড়িত, শোষিত, নির্যাতিত ও শংকিত । তবে, উচ্চ শিক্ষিত গৃহিনী এবং কর্মজীবী নারীগণ বহুলাংশে এপরিস্থিতির আওতাবহির্ভূত। লেখাপড়া না জানা গৃহিনী এবং দিনমজুর পরিবারের ক্ষেত্রে নারী বৈষম্য-প্রকট। জন্মের পর থেকে পরিবারে শুরু হয় নারীর প্রতি বৈষম্য ও নির্যাতনের এক ধরনের নিয়মতান্ত্রিক সমাজ প্রচলিত নিষ্ঠুর অনুশীলন। অথচ পরিবারের সুখ ও সমৃদ্ধি আনয়নে রাত দিন প্রাণান্ত পরিশ্রমে একজন নারীর কোন অবসর নেই। নিজের ব্যক্তিগত আরাম আয়েশকে উপেক্ষা করে আমৃত্যু সংসারের ঘানি টেনে চলেন একজন নারী। নারীর এ অবদানকে নানা দুর্বল যুক্তি দিয়ে খাট করে দেখে পরিবারে তাকে একজন নির্ভরশীল সদস্য হিসেবে মনে করে তার প্রতি অবহেলা ও নির্যাতনের এ নিষ্ঠুর প্রথা মানবাধিকারসহ ব্যক্তি অধিকারের চরম লঙ্ঘন। একারণে নারী নির্যাতনের বিষয়টি বর্তমানে সভ্যতার অগ্রগতির সাথে খুবই স্পর্শকাতর বিষয় হিসেবে সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে এবং তা প্রতিরোধের জোর তাগিদ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ লক্ষ্যে পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন, প্রকৃতি, প্রভাব, কারণ ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্যের অপরিহার্যতা ও পর্যাপ্ততার বিষয়টি বর্তমানে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। এরই সূত্র ধরে সাম্প্রতিককালে বিশেষতঃ এনজিও ও নারী সংগঠনগুলোর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও উদ্যোগে নারী নির্যাতনের কারণ, প্রকৃতি, প্রভাব নিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক সমীক্ষা কার্য পরিচালিত

হয়েছে। এসব সমীক্ষার মাধ্যমে মূলতঃ নারী নির্যাতনের সামগ্রিক দিক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করা হয়েছে। নারী নির্যাতনের প্রাথমিক ও সবচাইতে স্পর্শকাতর ও তাৎপর্যপূর্ণ ক্ষেত্র হচ্ছে পরিবার। পরিবারে নারীর প্রতি যেসব সহিংসতা সংঘটিত হয় তাকে বিশেষ দৃষ্টি দিয়ে কেবলমাত্র পারিবারিক পর্যায়ে সংঘটিত সহিংসতা বিষয়ে সমীক্ষা কাজের সংখ্যা খুবই সীমিত এবং এসব ক্ষেত্রে আবার নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে সমীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হয়েছে। অথচ মধ্যবিত্ত পরিবারে সংঘটিত সহিংসতার ঘটনাগুলো বেশিরভাগ সময় প্রকাশিত হয় না এবং তা জানাশোনার বাইরে থেকে যায়। এ দিকটিকে বিশেষ বিবেচনায় রেখে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত পরিবারে সংঘটিত নারীর প্রতি সহিংসতার ধরন, প্রকৃতি ও কারণ সম্পর্কে জানার মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে কিশোরগঞ্জ জেলাধীন তাড়াইল থানার ভালাজাঙ্গা, বাঁশটি, কুন্দ্রাটি, আকুবপুর ও শাহাবাগ -এ পাঁচটি গ্রামে একটি সমীক্ষা কাজ পরিচালনা করা হয়।

মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনা সম্পর্কে জানার বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও জটিল বিধায় গবেষক গবেষণা এলাকায় তিনমাস ধরে অবস্থান করে নির্দিষ্ট উত্তরদাতাদের পাশাপাশি ঐ সকল গ্রামের অধিকাংশ মহিলার সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তথ্য সংগ্রহে সাক্ষাৎকার অনুসূচির সাহায্য নেয়া হলেও বস্তুতপক্ষে অনানুষ্ঠানিক গল্পগুজব ও আলাপ আলোচনার মাধ্যমেই তথ্য সংগ্রহকে সমীক্ষায় সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হয়। পাশাপাশি মহিলাদের সাথে দলগতভাবে মুক্ত আলোচনার মাধ্যমেও তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এ কারণে নমুনা হিসেবে ৩১ জনকে বিবেচনা করা হলেও সমীক্ষার ফলাফলে পাঁচটি গ্রামের অধিকাংশ মহিলার মতামতের প্রতিফলন ঘটেছে। তথ্য সংগ্রহকারী সমলিঙ্গের হওয়াতে উত্তরদাতারা এবং গ্রামবাসী মহিলারা খোলামেলাভাবেই বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য সরবরাহ করেছেন এবং দীর্ঘদিন গবেষণা এলাকায় অবস্থানের কারণে ও তথ্য সংগ্রহকারী গবেষণা এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা হওয়ায় অনেক ঘটনা সরাসরি পর্যবেক্ষণ ও প্রত্যক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। কেস-স্টাডির পাশাপাশি এ সমীক্ষাটিতে মূলতঃ প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণমূলক অনুসন্ধান পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়েছে।

## গবেষণায় প্রাপ্ত উল্লেখযোগ্য ফলাফল বিশ্লেষণ

### ক. ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়াবলী

বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের বয়েস সর্বনিম্ন ১৮ বছর হবার কথা থাকলেও তার আগেই অনেক মেয়েকে স্বামীর ঘরে যেতে হয়। বাল্য বিবাহের হার পূর্বের তুলনায় কমে আসলেও এ সংখ্যা এখনও তাৎপর্যপূর্ণ, পাশাপাশি আমাদের দেশে বিবাহের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর বয়েসের ব্যবধান খুব বেশি যা দাম্পত্য জীবনে খাপ খাওয়ানোসহ সকল পর্যায়ে কিছু প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সমীক্ষাধীন উত্তরদাতাদের গড় বয়েস ৩৫.৮৯ বছর এবং তাদের স্বামীর গড় বয়েস ৪২.৪৮ বছর এবং তাঁরা গড়ে ১৭.৫ বছর ধরে দাম্পত্য জীবন যাপন করছেন ও তাদের গড় সন্তান সংখ্যা ৪.১৯ জন। উত্তরদাতাদের ৯০ শতাংশ লেখাপড়া জানলেও তাদের কেউই উচ্চ মাধ্যমিক

পর্যায়ের পর আর লেখাপড়া করেননি। জাতীয় পরিসংখ্যানের (১৯৯১ সালে লোকগণনা রিপোর্ট অনুযায়ী গ্রামে বসবাসরত নারীরে শতকরা ২০.৩ শতাংশ লেখাপড়া জানেন।) তুলনায় উত্তরদাতাদের শিক্ষার হার অনেক বেশি হওয়া সত্ত্বেও আয় উপার্জনমূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত হবার প্রবণতা খুব কম পরিলক্ষিত হয়। ৮০.৬৫ শতাংশ উত্তরদাতা উপার্জনমূলক কোন কর্মের সাথে যুক্ত নন বলে জানিয়েছেন। গ্রামীণ দরিদ্র মহিলারা দারিদ্র্য মোকাবেলায় এক রকম বাধ্য হয়ে কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে আসলেও মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা পারিবারিক বিধিনিষেধ, কৌলিন্য ও তথাকথিত পশ্চাৎপদ মধ্যবিত্ত মূল্যবোধে লালিত, শাসিত ও প্রতিপালিত হবার কারণে আজকের যুগেও মূলতঃ গৃহস্থালীর কাজে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখে পরনির্ভরশীল জীবন যাপন করছেন।

শহরে একক বা অনুপরিবারের সংখ্যাধিক্য থাকলেও বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনও যৌথ পরিবারের সংখ্যা বেশি দেখা যায়। সমীক্ষাধীন উত্তরদাতাদের ৪১.৯৩ শতাংশ একক পরিবারের সদস্য। বাকীরা যৌথ পরিবারে বসবাস করছেন বলে জানা যায়। তবে পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য, ব্যক্তিগত স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, নির্যাতন ইত্যাদি যৌথ পরিবারে বেশি মাত্রায় কার্যকর থাকে বলে যৌথ পরিবারে বসবাসকারী উত্তরদাতারা যৌথ পরিবারে অবস্থান করাকে নেতিবাচক বলে মনে করেন।

### খ. উত্তরদাতাদের পারিবারিক অবস্থান ও মর্যাদা

ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে বাংলাদেশের সর্বত্র কিছু ব্যক্তিক্রম ছাড়া জীবনের স্বাভাবিক গতি প্রবাহে পুরুষ নারীকে সঙ্গী না ভেবে নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। নারীর উপার্জিত অর্থ থেকে শুরু করে জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে পুরুষের আধিপত্য এক অলিখিত বিধান হিসেবে প্রচলিত রয়েছে। সমীক্ষাধীন উত্তরদাতাদের ৬.৪৫ ভাগ মহিলা চাকুরিজীবী এবং ১২.৯ শতাংশ উত্তরদাতা হাঁস মুরগীর খামার করে পরিবারে বাড়তি কিছু নগদ অর্থের সংস্থান করছেন। এ ছাড়া বাকীরা কোনরূপ আয়মূলক কর্মের সাথে জড়িত নেই এবং তারা সম্পূর্ণরূপে পরনির্ভরশীল। এ ধরনের পরনির্ভরশীলতা পরিবারে তাদেরকে নিচু মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। যদিও ধরে নেয়া হয় কিংবা বলা হয়ে থাকে যে, মহিলারা আয় উপার্জন করলে পরিবারে তাদের মর্যাদা বাড়ে, অবস্থান দৃঢ় হয় এবং স্বামী ও অন্যান্য সদস্যরা তাকে সমীহ করে, একথা কোন কোন ক্ষেত্রে বাস্তবভিত্তিক হলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য নয়। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায় চাকুরির মাধ্যমে পরিবারে অর্থের সংস্থান করলেও তাদের পারিবারিক অবস্থানে বিশেষ কোন পরিবর্তন হয় নি। উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষে চাকুরি করার "অপরাধে" তাকে সইতে হয় গালিগালাজ ও অন্যান্য মানসিক নির্যাতন। "মহিলাদের চাকুরি করার দরকার কি?"; "ঘরের বৌ চাকুরি করলে মান-সম্মান যাবে"; "ঘরের বৌ চাকুরি করলে সংসার ছেলেমেয়ে কে দেখবে?" এধরনের মনোভাব ও ধারণা পোষণ করেন অধিকাংশ স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ী। অনেক সময় স্ত্রীর আয় স্বামীর আয়ের তুলনায় বেশি হলেও স্ত্রীকে এ "অপরাধে" নির্যাতনের শিকার হতে হয় এবং এক পর্যায়ে তার চাকুরি কিংবা কাজ থেকে সরে আসতে বাধ্য হতে হয়।

সমীক্ষায় একজন উত্তরদাতার কাছ থেকে এরূপ অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি জানান তার হাঁস-মুরগীর খামারের আয় স্বামীর ব্যবসায়ের আয়ের চেয়ে বেশি হওয়ায় তার স্বামী তাকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। স্বামী কোনরূপ কারণ ছাড়াই তার সাথে নিয়মিত খারাপ ব্যবহার করেন, কথা বলতে চান না। আমাদের প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থায় স্ত্রীরা সব সময় সব দিক থেকে স্বামীর অধস্তন থাকবে এরূপ একটা মনোভাব পোষণ করা হয় বলেই স্ত্রীর বেশি উপার্জনের মতো ইতিবাচক বিষয়টি স্বামীর মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সম্পত্তিতে নারীর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ পুরুষ সমাজ মেনে নিতে চায় না। আর এ কারণে পৈত্রিক সম্পত্তি পাবার আইনগত অধিকার মুসলিম নারীদের থাকলেও ভাইয়েরা সহজভাবে গ্রহণ করবে না ও বাবার বাড়ীতে তাদের কোন মর্যাদা ও অবস্থান থাকবে না এ বাস্তবতার কথা ভেবে বেশিরভাগ মহিলা পিতার সম্পত্তি গ্রহণ করেন না। সমীক্ষাধীন উত্তরদাতাদের সকলেই উপর্যুক্ত কারণে পৈত্রিক সম্পত্তি ভাইদেরকে দিয়ে এসেছেন। স্বামীর সংসারের নিরাপত্তাহীনতার কারণে অন্তত এই ত্যাগের বিনিময়ে শেষ আশ্রয়স্থল পিতার গৃহে একজন নারী একটা অবস্থান বজায় রাখতে চায় যদিও অনেক সময় স্বামীর চাহিদা ও চাপের মুখে অসংখ্য নারী পিতার কাছ থেকে পাওয়া সম্পত্তি বিক্রি করে স্বামীর হাতে তুলে দিয়ে সম্পূর্ণ নিঃস্ব হয়ে যায়। এভাবে নারী তার সব কিছু ত্যাগের পাশাপাশি প্রতিদিন সকাল থেকে গভীর রাত পর্যন্ত সংসারের ঘানি টেনেও নিজের অবস্থানকে মর্যাদার আসনে বসাতে পারেনি। সমীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, দৈনিক গড়ে ১০.৭ ঘণ্টা গৃহস্থালীর কাজে একজন নারী ব্যস্ত থাকেন। তাঁরা জানিয়েছেন শ্রমের কোন স্বীকৃতি তাঁরা পান না কিংবা কষ্ট করছেন বলে স্বামী বা স্বামী সংসারের সদস্যরা তাঁদের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং ভালো আচরণ করেছেন এমন অভিজ্ঞতাও তাঁদের নেই। তাঁর উপর অর্পিত দায়িত্বের বোঝা বইতে সামান্য ভুলের কারণে সকলে মিলে এক হাত দেখে নেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, নিজেদের বা পরিবারের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মেয়েদের কোন মতামত গ্রহণ করা হয় না। নিজ থেকে কিছু বললেও তা কেউ গ্রাহ্য করে না। পরিবারের বিভিন্ন কাজকর্মে যেমন- জমি কেনা, বাড়ী তৈরী, আসবাবপত্র কেনা ইত্যাদি বিষয়ে কে সিদ্ধান্ত নেন এ প্রশ্নের উত্তরে প্রায় ৬০ শতাংশ উত্তরদাতা জানান যে ঐ সমস্ত বিষয়ে স্বামী সিদ্ধান্ত নেন। এছাড়াও পারিবারিক সিদ্ধান্তে শ্বশুর ও সকল ছেলে, ভাশুর, শাশুড়ী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন বলে জানা যায়। পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে অংশগ্রহণ করেন এমন উত্তরদাতার সংখ্যা মাত্র ২২.৫৮ শতাংশ। পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্ত্রীর মতামত নেয় হয় না কিংবা তাদের মতামতের গুরুত্ব দেয়া হয় না। সন্তানের লেখাপড়া, বিয়ে ইত্যাদি বিষয়েও মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুযোগ যথেষ্ট সীমিত বলে সমীক্ষার ফলাফলে জানা যায়। যদিও প্রাত্যহিক রান্নার কাজে স্ত্রী নিজ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী করতে পারেন, সেক্ষেত্রে রয়েছে ভিন্ন সমস্যা। স্বামী বাজার করেন স্বামীর ইচ্ছা অনুযায়ী এবং স্ত্রী রান্না করেন ঐসব সামগ্রীই। এক্ষেত্রে শাশুড়ীও অনেক সময় নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করেন। একজন উত্তরদাতা জানান তাঁর স্বামী রান্নার চাল পর্যন্ত নিজ হাতে মেপে দেয় এবং কোনটি কি পরিমাণ রান্না হবে তা বলে দেয় এবং রান্নার পর রান্না খারাপ কিংবা খাবার কম/বেশি হলে তাকে গালমন্দ শুনতে হয়। আরেকজন উত্তরদাতা জানান তাঁর

স্বামীর কৃপণ স্বভাবের জন্যে ছেলেমেয়েকে ভালো কিছু রান্না করে খাওয়াতে পারেন না। সংসারের কাজকর্মের চাপ এতটাই বেশি থাকে যে গ্রামীণ মধ্যবিত্ত নারীরা সারাদিনে কাজকর্মের ফাঁকে একটু অবসর সময় বের করতেও সমস্যায় পড়েন। অনেকের বাড়ীতে টেলিভিশন থাকলেও কাজের চাপে তারা তা দেখতে পান খুব কমই। কোথাও বেড়াতে যাবার সুযোগও কম। পাড়া প্রতিবেশীর সাথে গল্পগুজব করা কিংবা পাশের বাড়ীতে বেড়াতে চাইলেই বিধিনিষেধের মধ্যে পড়তে হয় বেশির ভাগ নারীকে। বাবার বাড়ীতে বেড়াতে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ী, ভাসুর কিংবা অন্য কোন কর্তা ব্যক্তির দয়ার উপর তা নির্ভর করে এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের সে ইচ্ছা পূরণ হয় না। উত্তরদাতারা স্বামীর সংসারে আত্মসম্মান নিয়ে বসবাস করছেন কি না জানতে চাইলে ৮৩ শতাংশ উত্তরদাতা জানান তাঁরা পরিবারে নিজেদের আত্মসম্মান নিয়ে অবস্থান করতে পারেন না। এর ব্যাখ্যায় তারা বর্ণনা করেন যে, স্বামী তাঁদেরকে মানুষ হিসেবে গণ্য করে না। তাদের মতামতের কোন মূল্য দেয় না। কোন ব্যাপারেই তাদের মতামত নেয়ার প্রয়োজন পর্যন্ত মনে করে না; শারীরিকভাবে নির্যাতন করে; শাশুড়ী অত্যাচার করে, দাসীর মতো রাত দিন সংসারের কাজে ব্যস্ত রাখে অথচ সব সময় দুর্ব্যবহার করে। নিজ পছন্দে বিয়ে করার অপরাধে অনেক মহিলার শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা তাদেরকে ছয় সাত বছর অতিবাহিত হবার পরও স্বাভাবিকভাবে মেনে নেয় নি। সকলে তাদের সাথে এরূপ আচরণ করে যেন তাঁরা ভীষণ বড় অপরাধ ও পাপ করে ফেলেছেন। এ নিয়ে তাঁদেরকে সংসারে ছোট হয়ে থাকতে হয় বলে জানিয়েছেনে। স্বামী পরিবারের সদস্যরা স্ত্রীর উপর সন্তুষ্ট এবং তার সাথে ভালো আচরণ করে এমন দৃষ্টান্ত খুব কম লক্ষ্য করা যায়। স্ত্রীর বাবার বাড়ীর লোকেরা বেড়াতে আসলে স্বামী বা স্বামী পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা অনেক ক্ষেত্রে সৌজন্যমূলক আচরণ পর্যন্ত করে না। প্রায় অর্ধাংশ উত্তরদাতা জানিয়েছেন তাদের বাবা বা ভাই বোন বেড়াতে আসলে স্বামী, শাশুড়ী, ননদ তাদের সাথে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলে না। ভালো খাবারের আয়োজন করে না এমনকি উত্তরদাতারা স্বামী ও শাশুড়ীর ভয়ে ইচ্ছা ও সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও তার বাবার বাড়ীর লোকদের ভালো খারার রান্না করে খাওয়াতে পারে না। স্বামী কিংবা অন্যান্যরা অনেক সময় বাড়ীর লোকদের সামনে নানা মিথ্যা নালিশ করে। এভাবে রান্না ঘর থেকে শুরু করে একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়াবলী সকল ক্ষেত্রে নারীরা পরিবারে অন্যের উপর নির্ভরশীল ও শৃঙ্খলিত জীবন যাপনে বাধ্য হচ্ছেন। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া তারা পরিবারে যেন খানিকটা অপরিহার্য অথচ অপাংক্তেয় হিসেবে নিজেদের স্বীয় সত্তাকে বিসর্জন দিয়ে কোন রকমে টিকে আছেন।

### গ. পারিবারিক সহিংসতা ও এর স্বরূপ

বিবাহিত জীবনের শুরুতেই একজন নারীকে চিরায়ত দায়িত্ব হিসেবে ঘর গৃহস্থালীর যাবতীয় কাজসহ সন্তান ধারণ, লালন-পালন, স্বামী সেবা, স্বামী সংসারের সকল সদস্যদের সন্তুষ্টি বিধান ইত্যাদি অসংখ্য দায়িত্ব মাথা পেতে নিতে সমাজ এক রকম অলিখিত প্রথা ও নিয়মের মাধ্যমে বাধ্য করে। সংসারের শৃংখলা, সুখ-শান্তি বজায় রাখার দায় যেন নারীর একার। যিনি সংসারের শান্তি ও সমৃদ্ধির জন্যে কাক ডাকা

ভোর থেকে গভীর রাত পর্যন্ত নিরলসভাবে প্রাণান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছেন তিনি প্রতিপদে লাঞ্ছিত, অপদস্থ ও নিগৃহীত; কেননা তিনি নারী। সংসার জীবন কেমন কাটছে এ প্রশ্নে জবাবে সমীক্ষাধীন অধিকাংশ মহিলা এক বাক্যে ভালো নয় বলে জানিয়েছেন। দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া তাঁরা জীবনের প্রতি চরম বীতশ্রদ্ধ, তাঁদের বক্তব্য সংসার জীবন আর ভালো লাগে না, জীবন অতিষ্ঠ বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না, সংসারের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি, স্বামী শাশুড়ীর নির্যাতন, পরিবারে ঝগড়া বিবাদ ও অশান্তি এসব মিলিয়ে তাঁরা ক্লান্ত ও চরম হতাশায় নিমজ্জিত। সমীক্ষাধীন মহিলাদের ৬.৪৫ শতাংশ স্বামীর অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে স্বামীকে তালাক দেবার চিন্তাভাবনা করছেন বলে জানা যায়। জীবনের প্রায় শেষ প্রান্তে এসে কিছু সংখ্যক মহিলা চরম হতাশাব্যঞ্জক ও বেদনাদায়কভাবে নিজেদের জীবনকে মূল্যায়ন করেছেন। দুই যুগেরও অধিককালের দাম্পত্য জীবনে তাঁরা কোন সুখ পাননি। অতি দুঃখ কষ্ট ও বেদনা নিয়ে কেবলমাত্র সন্তানদের ভবিষ্যত চিন্তা করে এবং লোক-লজ্জার ভয়ে স্বামীর সংসারে পড়ে আছেন।

সারণি-৩: সংসার জীবন সম্পর্কে উত্তরদাতাদের নিজস্ব মূল্যায়ন

| মূল্যায়নের ধরন | গণসংখ্যা | শতকরা |
| --- | --- | --- |
| সংসার জীবন আর ভালো লাগে না, জীবন অতিষ্ঠ মনে হয়, বেঁচে থাকতে ইচ্ছে হয় না | ৪ | ১২.৯০ |
| সংসার করা মানেই ঝামেলা, সংসার জীবন খুব কঠিন, সারাদিন ব্যস্-ভাবে কাটে | ৭ | ২২.৫৮ |
| সংসার জীবন ভালো লাগে না, সাংসারিক ব্যস্ততা, স্বামী/শাশুড়ীর নির্যাতন, পারিবারিক অশান্তি সব মিলিয়ে কান্ত | ২ | ৬.৪৫ |
| জীবন প্রায় শেষের পথে, তবু দুঃখ-কষ্টে কাটছে, সারা জীবন সুখ পাননি, সন্তানদের কথা চিন্তা করে আজও সংসার করে যাচ্ছেন | ২ | ৬.৪৫ |
| সংসার জীবনে খুবই অশান্তিতে আছেন, প্রতিনিয়ত স্বামীর গালমন্দ ও অত্যাচার সহ্য করতে হয় | ২ | ৬.৪৫ |
| স্বামীর অত্যাচারের কারণে ডিভোর্সের কথা ভাবছেন | ২ | ৬.৪৫ |
| স্বামীর দ্বিতীয় বিয়ের কারণে জীবন দুঃসহ হয়ে গেছে | ২ | ৬.৪৫ |
| বর্তমান জীবন অসহায় অবস্থায় উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটছে, পারিবারিক সমস্যার কারণে বিপর্যস্ত অবস্থায় আছেন | ৩ | ৯.৬৭ |
| সংসার জীবন ভাল-মন্দ মিলিয়ে কাটছে, মাঝে-মাঝে ভালো লাগে, মাঝে-মাঝে অসহ্য লাগে, সুখ-দুঃখে কাটছে | ৭ | ২২.৫৮ |
| মোট | ৩১ | ১০০.০০ |

নারীর গৃহশ্রম মূল্যহীন হিসেবে বিবেচিত হলেও সংসারের দায়িত্ব পালনে কোন রকম ভুলত্রুটি হলে স্বামী শাশুড়ীসহ অন্যান্য সদস্যরা তিরস্কার, গালমন্দ এমনকি ক্ষেত্র বিশেষ শারীরিক নির্যাতন করে। গবেষণাধীন উত্তরদাতাদের ৯০ শতাংশের বেশি

সংখ্যক জানিয়েছেন, সংসারের কাজকর্ম করতে গিয়ে অসাবধানতা কিংবা দুর্ঘটনাবশতঃ কোন ভুলত্রুটি হলে তারা খুব ভীত সন্ত্রস্ত থাকে। কারণ এর পরিণাম হয় ভয়াবহ; স্বামী, শাশুড়ী, ননদ সকলে মিলে বকাঝকা করে এবং ক্ষেত্র বিশেষে মারধর পর্যন্ত করে। কোন কোন ক্ষেত্রে স্বামী রেগে গিয়ে মারধরের পাশাপাশি ঘরের জিনিসপত্র তছনছ ও ভাঙচুর করে পরিবারে বিশৃঙ্খলা ঘটায় এবং স্ত্রীর সাথে কথা বলা বন্ধ করে দেয়।

সারণি -৪ : সংসারের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুলত্রুটি হলে পরিবারের সদস্যদের আচরণের বিন্যাস

| আচরণের ধরন | গণসংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| স্বামী গালমন্দ/বকাঝকা করে | ১৪ | ৪৫.১৬ |
| শাশুড়ী বকাঝকা করেন, উস্কানিমূলক কথা শোনান | ৬ | ১৯.৩৫ |
| শাশুড়ী ননদ মিলে তিরস্কার করে | ৪ | ১২.৯০ |
| স্বামী বকাঝকা ও মারধর করে | ৩ | ৯.৬৮ |
| স্বামী রেগে গিয়ে বিশৃঙ্খলা ঘটায় | ১ | ৩.২৩ |
| শাশুড়ী ভালোভাবে বুঝিয়ে দেন, সবাই সহানুভূতিশীল | ৪ | ১২.৯০ |
| মোট | ৩৫* | |

* একটির উত্তর

৭০ শতাংশের বেশি সংখ্যক উত্তরদাতা স্বামীর মন যুগিয়ে চলার জন্যে নিজের পছন্দ অপছন্দকে বিসর্জন দিয়ে একমাত্র স্বামীর নির্দেশ ও মতামতের ভিত্তিতেই যে কোন কাজ করে থাকেন। এর পরও স্বামীকে কিংবা স্বামীর পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের খুশি করতে তাঁরা সক্ষম হয়ে উঠেন না বলে জানিয়েছেন।

সারণি-৫ : স্বামী পরিবারের সদস্যরা উত্তরদাতাদের প্রতি সন্তুষ্ট কিনা সে সম্পর্কিত তথ্যের বিন্যাস

| সন্তুষ্টির ধরন | গণসংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| সন্তুষ্ট নয় | ১৭ | ৫৪.৮৪ |
| স্বামী ছাড়া অন্যান্যরা সন্তুষ্ট | ৭ | ২২.৫৮ |
| শাশুড়ী অসন্তুষ্ট | ২ | ৬.৪৫ |
| মাঝে-মাঝে মনে হয় সন্তুষ্ট, মাঝে-মাঝে অসন্তুষ্ট | ৩ | ৯.৬৮ |
| সকলেই সন্তুষ্ট | ২ | ৬.৪৫ |
| মোট | ৩১ | ১০০.০০ |

গবেষণার তথ্য সংগ্রহকালে উত্তরদাতাদেরকে যখন স্বামীর সাথে কি কি বিষয়ে মিল হয় এ বিষয়টি প্রশ্ন করা হয় তখন অধিকাংশ উত্তরদাতা দীর্ঘ সময় নিয়েছেন। মনে হয়েছে তাঁরা এমন কোন বিষয় মনে করতে পারছেন না। কিন্তু দলীয় আলোচনা কালে স্বামীর সাথে কি বিষয়ে মতের অমিল হয় এ বিষয়ে জানতে চাইলে অংশগ্রহণকারীদের বেশির ভাগই দীর্ঘক্ষণ ধরে তাঁদের অমিল হওয়া বিষয়গুলো বর্ণনা করতে থাকেন। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী প্রায় অধিকাংশ মহিলার বক্তব্য হলো স্বামীর সাথে তাদের প্রতিটি ক্ষেত্রে মতের অমিল হয় এবং স্বামী তাদের কোন কথা এবং কাজ পছন্দ করে না অথচ সন্তানের লেখাপড়া, সংসারের কাজকর্ম, সবার সেবাযত্নের ভার স্বামীরা সব সময় তাদের উপর চাপিয়ে দেয়। উত্তরদাতাদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশের স্বামীরা যৌতুক দাবী করে নানা অশান্তি সৃষ্টি করে বলে জানা যায়। যৌতুকের দাবী স্ত্রীর বাবা-মা সময় মতো মেটাতে না পারার কারণে প্রায় ৩৬ শতাংশ উত্তরদাতা স্বামী কর্তৃক প্রায়শই গালিগালাজ ও ক্ষেত্র বিশেষে মারধরের শিকার হয়ে থাকেন। একজন উত্তরদাতা জানান বিয়ের সময় নগদ টাকা গয়না ফার্ণিচার ইত্যাদি দিয়ে দেয়া সত্ত্বেও তাঁর স্বামী মোটর সাইকেল কিনে দেবার জন্যে তাঁর মাধ্যমে তাঁর বাবার বাড়ীর লোকদের উপর চাপ সৃষ্টি করছে। স্বামীর সাথে একজোট হয়ে শাশুড়ী ও ননদরা তাঁকে নিয়মিত যৌতুকের টাকা নিয়ে গালমন্দ করে। আরেকজন উত্তরদাতা জানিয়েছেন যৌতুকের টাকা নিয়ে ঝগড়া বিবাদের এক পর্যায়ে স্বামী তাঁর মতামত না নিয়ে আরেকটি বিয়ে করে এনেছে এবং তাকে বাবার বাড়ীতে চলে যেতে বলছে।

সারণি-৬ : বাবার বাড়ী থেকে উপহার-সামগ্রী বা যৌতুক না এনে থাকলে কিংবা চাহিদা অনুযায়ী না এনে থাকলে স্বামী বা স্বামী পরিবারের সদস্যরা উত্তরদাতার প্রতি কিরূপ আচরণ করে তার বিন্যাস

| আচরণের ধরন | গণসংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| যৌতুকের টাকা পুরোপুরি দেয়া হয়নি বলে স্বামী বাবার বাড়ীতে চলে যেতে বলে অথবা টাকা নিয়ে আসতে বলে ও র্ভৎসনা করে | ১ | ৩.২৩ |
| উপহার সামগ্রীর জন্যে শাশুড়ী ও ননদ র্ভৎসনা করে ও প্রায়শ্যঃই অপমান করে | ৬ | ১৯.৩৫ |
| যৌতুকের জন্যে স্বামী নিয়মিত টাকা এনে দিতে বলে | ৫ | ১৬.১৩ |
| যৌতুকের জন্যে স্বামী মারধর করে | ১ | ৩.২৩ |
| নিয়মিত বাবার বাড়ী থেকে বিভিন্ন জিনিস পত্র এনে দিতে হয় | ২ | ৬.৪৫ |
| যৌতুক বা উপহার না আনার কারণে কেউ কিছু বলে না | ২০ | ৬৪.৫২ |
| মোট | ৩৫* | |

*একাধিক উত্তর

একজন জানায় বিয়ের আগে তার শ্বশুর কথা দিয়েছিলেন তাকে বিয়ের পরে পড়াশুনা করাবেন, কিন্তু বিয়ের পর বলছেন মেয়েদের সংসারের কাজ করতে এত পড়ালেখার দরকার কি? অন্য একজন মহিলা জানান তিনি স্থানীয় একটি এনজিও'তে শিক্ষিকার চাকুরীতে যোগদানের দ্বিতীয় দিনে স্বামী "পরিবারের অসম্মান" হবে বলে তাঁকে চাকুরী ছাড়তে বাধ্য করে। স্বামীরা অধিকাংশ সময় স্ত্রীদের উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায়। স্ত্রী কথা মতো না চললে স্বামী অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বেশি রেগে গেলে মারধর করে। এরূপ অভিজ্ঞতার শিকার সমীক্ষাধীন ৬১.২৯ শতাংশ উত্তরদাতা। উত্তরদাতাদের একাংশ জানিয়েছেন স্বামীকে তারা ভয় পান, কারণ স্বামী সামান্য কিছুতেই প্রচণ্ড রেগে গিয়ে জিনিসপত্র ভাঙচুর করেন এবং মারধর করে জখম করে; কোন বিষয়ে সামান্য প্রতিবাদ করলে তালাক ও দ্বিতীয় বিয়ের হুমকি দেয়, বাড়ী থেকে বের করে দেবার ভয় দেখায়, রাতে ইচ্ছে করে দেরীতে বাড়ী ফেরে, স্ত্রীর হাতের খাবার খায় না, উস্কানিমূলক কথাবার্তা বলে, অপমান করে। কোন কোন ক্ষেত্রে চিৎকার করে পরিবারে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। সন্তানদের অহেতুক বেদম প্রহার করে।

সারণি -৭ : উত্তরদাতাদের সাথে পারিবারিক ও ব্যক্তিগত বিষয়ে মতের অমিল হলে স্বামীর আচরণের ধরন ও প্রকৃতি

| স্বামীর আচরণের ধরন ও প্রকৃতি | গণসংখ্যা | শতকরা |
|---|---|---|
| ঝগড়া-বিবাদ হয়, স্বামী রেগে গিয়ে মারধর করে | ১৯ | ৬১.২৯ |
| ঝগড়া হয় এবং স্বামী গালিগালাজ করে | ৪ | ১২.৯০ |
| স্বামী জোর করে তার সিদ্ধান্ত স্ত্রীর উপর চাপিয়ে দেয় | ১২ | ৩৮.৭০ |
| রাগ করে স্বামী কথা বলা বন্ধ করে দেয় | ৪ | ১২.৯০ |
| পরিবারে অশান্তি সৃষ্টি করে, চিৎকার-চেচামেচি করে, | ১ | ৩.২৩ |
| সন্তানদের বিনা কারণে মারধর করে | | |
| জিনিসপত্র ভাঙচুর করে | ৩ | ৯.৬৮ |
| রাতে বাড়ী ফিরে না | ১ | ৩.২৩ |
| খারাপ ভাষায় গালিগালাজ করে, উস্কানিমূলক কথা বলে ও অপমান করে | ১ | ৩.২৩ |
| তালাক ও দ্বিতীয় বিয়ের হুমকি দেয়, বাড়ী থেকে বের করে দেয়/দিতে চায়, স্ত্রীর রান্না করা খাবার খায় না | ২ | ৬.৪৫ |
| মোট | ৪৭* | |

* একাধিক উত্তর

## উপসংহার

পারিবারিক পর্যায়ে নারীর প্রতি সহিংসতার ঘটনাটি সর্বজনীন। স্বরূপ ও প্রকৃতি ভিন্ন হলেও পৃথিবীর সব সমাজে, সব দেশেই নারীরা পরিবারে নিগৃহিত নির্যাতিত ও নিপীড়িত। একটি কন্যা শিশু পরিবারে জন্ম নেবার পর থেকেই অবহেলা ও অযত্নে সে লালিত হয়। এ অবস্থায় কিছুটা পরিবর্তন আজকের সমাজে সূচিত হলেও পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে একথা বলা যায় না। পরিবারকে নারী নির্যাতনের মৌলিক ক্ষেত্র ও উৎস হিসেবে নির্ধারণ করা যায় সহজেই এবং পরিবার নারীর প্রতি হীন দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাব সৃষ্টির উৎস হিসেবে কাজ করে থাকে। পুরুষ সদস্যরা পারিবারিক পরিবেশে তার মাতা ও বোনকে নির্যাতিত হতে দেখতে দেখতে বড় হয়, এক সময় বিষয়টি স্বাভাবিক হিসেবেই তার কাছে মনে হয় এবং পরবর্তীতে সে ব্যক্তি জীবনে তার অনুশীলন করে। একজন নারী পরিবারে নিগৃহিত হতে হতে প্রতিবাদ ও প্রতিকারের কথা চিন্তা না করে বরং ঘটনাটি পারিবারিক সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গ্রহণ করে এবং এক পর্যায়ে নিজে যখন শাশুড়ীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় তখন নিজ পুত্রবধূকে তার নিজস্ব অভিজ্ঞতার স্বাদ লাভে বাধ্য করে। নারীই হয়ে পড়ে নারী নির্যাতনের অনুঘটক। নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ ও বন্ধে আজ অবধি অসংখ্য আইন প্রণীত হয়েছে, এ সংক্রান্ত বিষয়ে অনেক সরকারী ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করছে কিন্তু পরিস্থিতির উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। বস্তুতপক্ষে যতদিন পারিবারিক পর্যায়ে সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপক পরিবর্তন না ঘটবে ততদিন আইন আদালত করে নারী নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব হবে না। সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনগুলো নির্যাতিত হবার পর নানা ধরনের সেবা ও সহযোগিতা কোন কোন নির্যাতিতকে দান করছে কিন্তু নির্যাতন বন্ধে কার্যকর কোন ভূমিকা রাখতে পারছে না। পারিবারিক সচেতনতা, সনাতন ধ্যান-ধারণা, মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে পরিবর্তনে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে নারী নির্যাতনের মাত্রা অনেকটা কমিয়ে আনা যেতে পারে। ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামী অনেকাংশে নারীর প্রতি সহিংসতা সৃষ্টিতে সহায়ক হিসেবে কাজ করে, এ ক্ষেত্রে মসজিদের ইমাম ও স্থানীয় ধর্মীয় নেতাদেরকে নারীদের অধিকার, অবস্থান ও মর্যাদা সম্পর্কিত ধর্মীয় বিধি বিধানের সঠিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষাদানের মাধ্যমে নিজ নিজ এলাকায় তা অনুশীলনের জন্যে কাজে নিযুক্ত করা যেতে পারে। পরিবারগুলোতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি নারীর প্রতি সঠিক মনোভাব সৃষ্টিতে পরিবারকেন্দ্রিক কাউন্সিলিং এর জন্যে বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন কর্মসূচি হাতে নিতে পারে। সরকার প্রচলিত আইনসমূহের কঠোর প্রয়োগ ও অনুশীলনের মাধ্যমে এবং পারিবারিক সহিংসতার শাস্তি ও এ সম্পর্কিত সরকারি আইন-কানুনের নানা দিক সম্পর্কে ব্যাপক প্রাচারণা চালাতে পারে। এতে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে পাশাপাশি তারা যে কোন ধরনের নারী নির্যাতন সম্পর্কিত অপরাধ সংঘটিত করা থেকে বিরত থাকার ব্যাপারে বাধ্য হয়েই আগ্রহী হবে এবং এক পর্যায়ে তা সামাজিক অনুশীলনে পরিণত হবে। পারিবারিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে মানুষের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তনের বাস্তবভিত্তিক পদক্ষেপ নিতে হবে যাতে পুরুষদের নারী সংক্রান্ত সনাতন ভ্রান্ত মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে। আধুনিক সভ্য সমাজের সদস্য হয়ে সমাজের অর্ধাংশ জনগোষ্ঠী সমাজের অপর অংশের দ্বারা নিষ্পেষিত হবে, নিপিড়িত হবে, নির্যাতিত হবে, এ অবস্থা কোন মতেই আর মেনে নেয়া যায় না। সভ্যতার প্রকৃত অগ্রগতি নিশ্চিত করতে গেলে নারী পুরুষের মধ্যকার সকল প্রকার বৈষম্য ও বিভেদকে দূর করে সমতা ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে আমাদের পথ চলতে হবে। আর তা না পারলে সভ্যতার জন্যে লজ্জাজনক এ ক্ষত পূরণ হবে না কখনই।

## তথ্য নির্দেশ


১. UNFPA Report; UN- 1997, P-35.

২. নিলুফার বেগম; "নারী";তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা-২০০০ পৃঃ ১৮ ।

৩. আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মে ৩১, ২০০০, পৃঃ৮

৪. পরিকল্পনা কমিশন, পঞ্চম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (১৯৯৭-২০০২), পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৯৮ ।

৫. Aywsa Noman; Status of Women and Fertility in Bangladesh; University Press L.T.D.; Dhaka,P-56.

৬. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; নারী আন্দোলনের একাল, দৈনিক প্রথম আলো, এপ্রিল ১২,২০০২, পৃঃ ১৬ ।

৭. মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান; পূর্বোক্ত, পৃঃ ১৬ ।

৮. "নারী" তৃতীয় বর্ষ ১ম সংখ্যা; মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর; ঢাকা-১৯৯৭, পৃঃ ৩ ।

৯. বি.আই.ডি.এস; নারীদের গৃহস্থালী কর্মকান্ড এবং জিডিপির হিসাবঃ কিছু প্রসঙ্গ, ১৯৯৮ ।

১০. "অধিকার" নারীপক্ষ, ঢাকা-১৯৯৭ ।

১১. The Bangladesh Times; September 7; 1995.

১২. Shamima Chowdhury and Others; The Agony of Silence;CFSD; Dhaka-1994, P-52.

১৩. Concerned Women for Family Planning-1998,P-54.

১৪. AIMS Research;1998,P-52

১৫. দৈনিক ভোরের কাগজ; জুলাই ১৫,২০০১ ।

১৬. দৈনিক ভোরের কাগজ; জানুয়ারী ১,২০০২ ।

১৭. http://www.womens.org/article.cfns/dyn/aid/885date5/12/02

১৮. দৈনিক প্রথম আলো; ফেব্রুয়ারী ২৮,২০০২ ।

১৯. দৈনিক প্রথম আলো; আগষ্ট ২৪, ২০০২ ।

২০. "প্রজন্ম" ৮ম বর্ষ ৭ম সংখ্যা; ঢাকা, এপ্রিল-১৯৮৯, প"ঃ১৫ ।

২১. Ain O Salish Kendra, Violence aganist Women- 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 and 2003, Documentation Unit, Dhaka.

২২. Martin, D. (1976), When Violence Begins at home- A comprehensive Guide to Understanding and Ending Domestic Abuse. Salt Lack: Publishers Press.

২৩. Burzwa, E. S., and C. G. Buzwa (1996). Domestic Violence- The Criminal Justice Response, California: SAGE.

২৪. Ptacek, J. (1988). "Why Do Men Better Their Wives" in Yllo and M. Bogard (eds.), Feminist Perspective on Wife Abuse. California: SAGE.

২৫. Elliot, J. (1976). "Neurology of Explosive Rage: The Dysfunctional Syndrome" in M. Roy (eds.), Battered Women A Psychological Study of Domestic Violence. New York: Van Norstrand Rienhold Company.

২৬. Dekesersdy, W. S. and L. Macleod (1997). Women Abuse A Sociological Story. Toronto: Hartcourt Brace.

২৭. Ibid.

২৮. Buzwa, E. S. and C. G. Buzwa, Ibid.

২৯. Dutton, D. G. Ibid.

৩০. Dekesersdy, W. S. and L. Macleod, Ibid.

৩১. Bogard, M. (1988). "Feminist Perspective on Wife Abuse." in Yllo and M. Bogard (eds.), Feminist Perspective on Wife Abuse. California: SAGE.

৩২. Dekesersdy, W. S. and L. Macleod, Ibid.

৩৩. Ibid.